নির্বাচন কমিশন কি সন্ত্রস্ত

জহর সরকার

Ananda Bazar Patrika, 11 April 2019

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, সিপিএম বা তৃণমূল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলার বহু আগেই আইএএস, আইএফএস, আইপিএস ও নানা কেন্দ্রীয় সার্ভিস-এর প্রায় দেড়শো জন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কমিশনকে ‘হলুদ কার্ড’ দেখিয়েছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন এক জনজাতির তিন অফিসার। এই দুই অভিযোগে পার্থক্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণ মূল জমানায় পরিচালিত সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন যে অবাধ হয়নি , সে স্মৃতি টাটকা। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও পরে বামফ্রন্ট আমলের ‘রিগিং’ও কুখ্যাত। কিন্তু ‘কনস্টিটিউশনাল কনডাক্ট’ বা সাংবিধানিক আচরণবিধি নাম দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে এর কোনওটির কথাই বলেননি অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা। এই দলে আছেন একাধিক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার, অনেক রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক এবং বহু প্রাক্তন রিটার্নিং অফিসার। এঁরা প্রত্যেকেই বহু নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সদস্যেরা তখন পদমর্যাদায় তাঁদের অনুজপ্রতিম ছিলেন। যখন বর্তমান কমিশনে তাঁদের ‘অনুজ সহকর্মীরা’ পক্ষপাতহীন কাজ করার নীতিগুলি থেকে সরে আসছেন বলে মনে করা হচ্ছে, তখন এই ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল মূল্যায়ন করতে পারবেন এই দলের সদস্যরাই। মনে রাখা দরকার , নির্বাচন কমিশনের অফিসাররা ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ ধারা এবং জনগণের আইনের প্রতিনিধিত্ব ১৯৫১ অনুসারে দায়বদ্ধ।

এই গোষ্ঠী কিছু কাল আগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন , যে হেতু অনেকেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থার ক থা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। ঘটনাচক্রে, এই গোষ্ঠীর সদস্যরা যে প্রজন্মের, সেই প্রজন্মের আধিকারিকরাই বিশ শতকের শেষ দশকে সোৎসাহে এই দেশে ইভিএম-এর প্রবর্তন করেছিলেন। এখন সেই গোষ্ঠীই মনে করছেন, এই যন্ত্রগুলি আগে যতটা অভ্রান্ত ভাবা হয়েছিল, আসলে ততটা নির্ভরযোগ্য না-ও হতে পারে। আসলে, গত দু’দশকে প্রযুক্তি ও হ্যাকিং কৌশল আরও আধুনিক হওয়ার ফলে সাধারণ জীবনেও সততার মাত্রা কমে গিয়েছে। তাই ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল বা ভিভিপ্যাট নামে এক নতুন ব্যবস্থা চালু করতেই হবে , যা ২০১৪ নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছিল। সে বার বন্দোবস্তটা ছিল পরীক্ষামূলক। এই ব্যবস্থায়, ভোটার যখনই ইভিএমে নিজের পছন্দের বোতাম টিপবেন, পাশে রাখা ছোট প্রিন্টারে একটা পেপার ব্যালট স্লিপ বেরিয়ে আসবে। এই পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট ভোটটি ঠিক জায়গায় পড়ল কি না, তা জানিয়ে দেওয়া হবে ভোটারকে। কাগজের টুকরোটি ইভিএমের কাছে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলে দেওয়া যেতে পারে, যাতে পরে গোনা যায়, অথবা ভোটের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে ভোটার তা ছিঁড়েও ফেলতে পারেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি বুথে ভিভিপ্যাট করা সম্ভব , তার বেশি নয়। এখন, একটি লোকসভা কেন্দ্রে গড়পড়তা ১৫০০ থেকে ২০০০ বুথ থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আধিকারিকদের গোষ্ঠীটি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন, বিধানসভা কেন্দ্র পিছু মাত্র

একটি (অর্থাৎ লোকসভা কেন্দ্র পিছু সাতটি) ভিভিপ্যাট ব্যবহারের পরিকল্পনা হাস্যকর , লোকসভা কেন্দ্র পিছু পেপার ট্রেলের শতাংশ অনেক বাড়ানো প্রয়োজন। তা হলেই নমুনা যাচাইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।

কিছু রাজনৈতিক দল দাবি করছে, পেপার ট্রেলের একশো শতাংশই গুনতে হবে। সেটা হয়তো ২০১৯-এ সম্ভব নয়। তবে আশা করা যায় যে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট সংখ্যক বুথে পেপার ট্রেল বাধ্যতামূলক করবে। সংখ্যাটা বর্তমানের সাত এবং লোকসভা কেন্দ্র পিছু মোট ১৫০০-২০০০ বুথের মাঝামাঝি কিছু একটা। অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা বার বার এই পরামর্শ দিয়ে এসেছেন নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু বর্তমান তিন সদস্যের কমিশনের বিষয়টি নিয়ে আদালত পর্যন্ত লড়তে যাওয়ার যে মনোভাব দেখিয়েছে, তা বিস্ময়কর, বিশেষত সুপ্রিম কোর্টে একুশটি রাজনৈতিক দলের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে। কমিশন ঘোষণা করেছে, পেপার ট্রেল ভোটের অর্ধেক গুনতেও ছ'দিন সময় লাগবে। এটা অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়, কেননা ব্যালট বাক্সের পুরনো ব্যবস্থায় যখন আমরা ব্যালট পেপার গুনতাম, তখনও গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় লাগত ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা। পশ্চিমবঙ্গের মতো যে রাজ্যে ইউনিয়নের দাপট বেশি ছিল, সেখানে এই প্রক্রিয়ায় আরও কিছু সময় বেশি লাগত গণনাকর্মীদের জন্য। 'টিফিন অ্যালাউয়্যান্স' ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বেশি পাওয়ার জন্য তাঁরা দেরি করতেন। কিছু দল জানিয়েছে, বিলম্বিত ফলের চেয়ে যথাযথ ফল পাওয়া বেশি দরকারি। এই গোষ্ঠীও বহু আইএএস আধিকারিকের, যাঁরা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, গণনা পদ্ধতি এত দীর্ঘ হতে পারে না। কমিশন কেন এত কঠোর আচরণ করছে তা স্পষ্ট নয়, তবে এ বিষয়ে মতামত স্থির করার আগে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখে নেওয়া দরকার।

প্রধানমন্ত্রীর অতিজাতীয়তাবাদী অহঙ্কার প্রক্ষেপের উদ্ধত প্রয়াস চলছে। মহাকাশে কয়েক দশক জুড়ে ভারত যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংস করে সেটাও আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন তিনি। এটা আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের শামিল। অথচ এ সব দেখছেই না কমিশন। সংশয় হয়, কমিশন মোদীকে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর জীবনের উপর নির্মিত ছবি নিয়ে এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'মোদী: আ কমন ম্যানস জার্নি' তথ্যচিত্রের পাবলিক স্ট্রিমিং বা মুক্তিলাভ ঠেকানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে কমিশন অস্বাভাবিক বেশি সময় নিয়েছে। 'নমো' টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলি নতমস্তক ও সন্ত্রস্ত, আর সাংবিধানিক রক্ষাকবচে বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন (যার নেতৃত্বে আছেন প্রাক্তন সম্প্রচার সচিব) আশ্রয় নিচ্ছে আমলাতান্ত্রিক কৌশলের। অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের গোষ্ঠী এবং অনেকগুলি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে, কোনও লাভ হয়নি। পঞ্চাশের দশকে সুকুমার সেনের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন কাজ শুরু করে, নব্বইয়ের দশকে টি এন শেষন তাকে শক্তিশালী করেন, তার পর থেকে কখনও কমিশনের এমন স্বেচ্ছা-নিষ্ক্রিয়তার ছবি চোখে পড়েনি।

এ দিকে, যে সরকারগুলিকে মোদী পছন্দ করেন না, তাদের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বদলি করার মতো পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করছে না বর্তমান কমিশন। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রামাণ্য অতীত এবং অপরাধমূলক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার দেখভাল করছে ন তামিলনাড়ুর ডিজিপি, যে রাজ্যে

ক্ষমতায় আছে প্রধানমন্ত্রীর জোটসঙ্গী। এক জন রাজ্যপাল স্পষ্ট রাজনৈতিক মন্তব্য করার পরেও একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি কমিশন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম নিষ্ক্রিয়। মোদীই ভারতীয় সেনার মালিক বলে ঘোষণা করেও পার পেয়ে গিয়েছেন তিনি। ভোটের প্রথম পর্ব শুরু হতে চলেছে। এবং সকালই বুঝিয়ে দেয় বাকি দিনটা কেমন কাটবে। স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে কঠিন নির্বাচন যদি সত্যিই স্বচ্ছ হতে হয়, তা হলে সরব হয়ে বা আদালতে গিয়ে (সম্ভব হলে দুটোই) নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালন করাতে হবে। যেR